ফ্ল্যাটের পাঁচতলার ব্যালকনির একেবারে সামনে একটা কদমগাছ। বিকেল নামতেই হাজার হাজার পাখি এসে বসে গাছের বাসায়। কলকাকলিতে মানুষের কণ্ঠস্বর, সাইকেল, রিক্সার শব্দ স-ব কিছু ঢেকে যায় এই সময়টায়। প্রায় তিরিশ-চল্লিশ মিনিট একটানা চলতে থাকে এই কাণ্ড। মনে হয় যেন পৃথিবীর সমস্ত পাখি এই গাছে এসে তাদের সারাদিনের গল্প বিনিময় করে পরস্পরের সঙ্গে। এত ভালো লাগে এই সময়টুকু! সুছন্দারও খুব ইচ্ছে করে ওদের সঙ্গে কথা বলতে। ইস্! পাখিদের ভাষাটা যদি শোনা যেত, তাহলে ওদের সারাদিনের কত অভিজ্ঞতা, কত উড়ান কত-কত কিছু যে জানা যেত! আর তারপর নিজের কথা বলেও বেশ খানিক হালকা হতে পারত। অনেক, অ-নে-ক কথা গোটা শরীর জুড়ে। এতগুলো বছর ধরে জমানো, পাহাড় হয়ে ওঠা কথা শোনার মতো কেউ নেই। কেউ না। সবাই যে যার মতো ব্যস্ত। ভাবতে ভাবতেই মোবাইল বেজে উঠল। ব্যালকনি ছেড়ে ঘরে এল সুছন্দা। এই সময়টায় মমিয়া রোজ ফোন করে।

"হ্যালো।"

"হুম, কী করছ?" ওদিক থেকে জিজ্ঞেস করল মমিয়া।

"এই তো ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম।"

"'পাখিসব করে রব' থেমেছে?"

"হ্যাঁ," বলে হাসল সুছন্দা।

"গা ধোওয়া হয়ে গেছে?"

"না, এই যাব এবার। আজ সারা দুপুর কারেন্ট ছিল না। এই একটু আগে এসেছে।"

"ওহ্। দুপুরে কী খেলে আজ?"

"ওই তো— মুগডাল সিদ্ধ দিয়েছিলাম, পোস্তর বড়া আর আলু-পটলের তরকারি।"

"কেন, মাছ খাওনি?"

"না। আজকে ভাল্লাগছিল না।"

"এই তো তোমার বাজে স্বভাব। কেন খাওনি? উফ্‌ফ্, তুমি না! রাত্রে খাবে কিন্তু, বলে রাখলাম।"

"আচ্ছা রে বাবা, ঠিক আছে।"

"ওষুধ?"

"হ্যাঁ, ওষুধও। তুই কখন বেরুবি?"

"দেখি," বলে একটু চুপ থাকে মমিয়া হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "কেউ

এসেছিল?"

"না তো, কে আসবে আবার?"

"নাহ্, এমনই জিজ্ঞেস করলাম। আচ্ছা, রাখছি।"

ওপারে মমিয়া ফোন রেখে দেওয়ার পরেও কানে রিসিভারটা রেখে দাঁড়িয়ে থাকল সুছন্দা। মমিয়া মাঝেমধ্যেই এই প্রশ্নটা করে। ও কার কথা জানতে চায়? কার আসার কথা ছিল? হাতের মুঠোয় মোবাইলটা ধরে সুছন্দা আবার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। সন্ধে হয়ে এসেছে। এরপর রাত নামবে। মমিয়া ফিরবে। কিছুক্ষণ গল্পগুজব। মমিয়ার সারাদিনের অফিসের গল্পের পর কিছু সংসারের কাজের কথা, তারপর রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু টিভি দেখে যে যার ঘরে। পরের দিনেও একই রুটিন, তার পরের দিনও। সুছন্দার এক-একসময় ইচ্ছে করে এই রোজের একঘেয়ে রুটিন ফেলে কোথাও পালিয়ে যেতে। ভালো লাগে না, কিচ্ছু ভালো লাগে না।

পাখির ডাক কমে এসেছে, সন্ধের আলো পুরোপুরি নিভে যাওয়ার পর আর একটা পাখিও ডাকবে না। কিংবা হয়তো অনেক রাত্রে কখনও ডেকে উঠবে একবার-দু'বার। ভাবতে ভাবতেই আবার 'এসো শ্যামল সুন্দর' রিংটোন। অসীম ফোন করেছে।

এখন? ফোন তুলে সুছন্দা বলল, "হঠাৎ এখন?"

অসীম ওদিক থেকে একগাল হেসে বলল, "কেন? এখন করতে নেই?"

"না না, তা নয়।"

"একটা বিশেষ দরকারে ফোন করলাম।"

"কী দরকার?"

"কেমন আছ তোমরা?"

"উফ্, অসীম তুমি না একটা— "

"কী আমি একটা?"

"বলব না," কিশোরী মেয়ের মতো গলায় বলল সুছন্দা।

ওদিক থেকে হো হো করে হাসল অসীম। তারপর বলল, "যাক গে, শোনো, যার জন্য ফোন করলাম। তোমার ওই দু'লাখ টাকার এফডি-টা এই মাসে ম্যাচিয়োর করবে।"

"ও, আচ্ছা।" শুধু এইটুকুই বলল সুছন্দা। অসীম যে ব্রাঞ্চে আছে সেখানেই সেভিংস অ্যাকাউন্ট সুছন্দার। টাকাপয়সার যাবতীয় হিসাব বরাবর অসীমই রাখে। সুছন্দা মাথা ঘামায় না।

"'ও আচ্ছা' মানে? এটা নিয়ে কী করবে ভেবেছ?"

"আমি কেন ভাবতে যাব?"

"বেশ, তাহলে আমিই নিয়ে নিই," বলে আবার হাসল অসীম।

"বেশ, তাহলে তুমিই নিয়ে নিয়ো," বলে সুছন্দাও হাসল।

"শোনো, আমার ইচ্ছে এই টাকাটা আবার ফিক্সড করে দাও। মমের বিয়ের সময় কাজে লেগে যাবে।"

"দাও।"

"ঠিক আছে। আর বলছি যে, অনেক দিন কোনো সিনেমা দেখি না। যাবে নাকি এর মধ্যে একদিন?"

"উফ্, অসীম, কেন আমার মুখ দিয়ে বারবার 'না' বলাও? জানো তো যেতে পারব না, তবু!"

"সু, আগে কিন্তু তুমি এমনটা ছিলে না। কত সিনেমা দেখেছ বলো তো আমার সঙ্গে!"

"আগে মম ছোটো ছিল, অসীম। এই কথাটা মাথায় রেখো। এখন ও বড়ো হয়েছে। বুঝে তো চলতেই হবে।"

"উফ্! শুধু বুঝে চলা আর স্যাক্রিফাইস! এ-ই হল আমার জীবন।"

"প্লিজ, অসীম! এইভাবে বললে আমার কিন্তু মন খারাপ করবে। তোমার ভালো লাগবে?"

"ওকে ওকে! ঠিক আছে, রাখছি।"

"টা-টা!"

"শুধু টা-টা? আমি যে গাল বাড়িয়ে রাখলাম।"

"একটা থাপ্পড়!" বলে হি হি করে হেসে ফোন কেটে দিল সুছন্দা। ফোনটা সামান্য গরম হয়ে উঠেছে কথার উত্তাপে। বুকের মাঝখানে চেপে ধরল সুছন্দা। আর কতদিনের অপেক্ষা বাকি কে জানে?

।। ২।।

মা যে এতগুলো বছর ধরে সারাদিন কী ভাবে বুঝতে পারে না মমিয়া। বাবা যখন মারা যায়, তখন মমিয়া ক্লাস সেভেন। নামকরা একটা কনস্ট্রাকশন কোম্পানির ইঞ্জিনিয়র ছিল অনীক চ্যাটার্জি, মমিয়ার বাবা। একটা আন্ডার-কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং-এর সিক্সথ ফ্লোর থেকে পড়ে গেছিল। এখনও চোখ বুজলেই মাঝেমধ্যে মমিয়ার মাথার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেদিনটার দৃশ্যগুলো। এতগুলো বছর পরেও এতটুকু হলুদ হয়নি সেই

দিনের স্মৃতি। বাবা কী করে পড়ে গেছিল? পা পিছলে, না অন্যমনস্কতায়, না কি এমনিই এমনিই... ইচ্ছে করে? কানাঘুষোতে পরে অনেক কিছু শুনেছিল মমিয়া। ওটা কি অ্যাক্সিডেন্ট, না অন্যকিছু ছিল তবে? প্রশ্নগুলো বিষপিঁপড়ের মতো বছরের পর বছর কামড়েছে মমিয়াকে। কিন্তু উত্তর পায়নি। তবে বাবা মারা যাওয়ার কিছুদিন পর থেকে অসীমকাকুর এই বাড়িতে আসা-যাওয়াটা অনেক বেড়ে গেছিল। বাবার ছোটোবেলার বন্ধু ছিল। পাশের পাড়ায় বাড়ি। ব্যাঙ্কে চাকরি করে। বিয়ে-থা করেনি। কেন করেনি জানে না মমিয়া। ও যখন ক্লাস সিক্স, বাবা অসীমকাকুকে ঠিক করে দিয়েছিল মমিয়াকে অঙ্ক শেখানোর জন্য। যখন-তখন অঙ্ক করাতে চলে আসত কাকু। তবে অঙ্কের থেকে মায়ের সঙ্গে গল্প করতেই যে লোকটা ভালোবাসত বেশি, সেটা বুঝত মমিয়া। অসীমকাকুর কথায় খুব হাসত মা। বাবা মারা যাওয়ার ছ-সাত মাস পর থেকে মা যেন কাকুর কথায় আগের থেকেও অনেক বেশি বেশি হাসত। এমনকি কাকুর বোকা বোকা জোকসগুলো শুনেও হি হি করে গড়িয়ে পড়ত প্রায়। সত্যিই কি মা'র এত হাসি পেত?

বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকটার প্রতি কেমন একটা বিরক্তিও বাড়ছিল মমিয়ার। ভাল্লাগত না একদম। তবে এটা সত্যি যে, সেই ক্রাইসিস পিরিয়ডটাতে অসীমকাকু পাশে না থাকলে খুব বিপদ হত। প্রথম প্রথম আত্মীয়-স্বজনরা খোঁজখবর নিত একটু-আধটু। কিন্তু তারপর যা হয় আর কী, ফিকে হতে শুরু করে সব গরজ। মা-র গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট ছিল না। অসীমকাকু সোর্স ধরে একটা আধা-সরকারি নার্সিংহোমে রিসেপশনে চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল মা-কে। এ ছাড়াও, একটা সংসার চালাতে গেলে যে হাজার রকমের সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়, কতকিছুর প্রয়োজন হয়, সেইসব ঝামেলা বিনা বিরক্তিতে মেটাত কাকু। বিনিময়ে শুধু বেড়েছিল এই সংসারের প্রতি অধিকার। এমনকি মমিয়া নিজে চাকরি পেয়ে মা-কে চাকরি ছাড়ানোর পরেও অসীমকাকুর প্রতি নির্ভরশীলতা এতটুকুও কমেনি মা'র। সংসারের সামান্য খুঁটিনাটি বিষয়েও কাকুর পরামর্শ নিত মা। এক-একসময় রাগ হয়ে যেত মমিয়ার। কথা বলতে ইচ্ছে করত না দু'জনের সঙ্গেই। অসীমকাকু কেন বিয়ে করেনি সেই প্রশ্নটাও বেশ কয়েক বার মা-কে করেছে মমিয়া। মা ঠোঁট উলটে বলেছে, "কী জানি বাবা কেন করেনি! দরকার নেই আমাদের ওসব জানার।" সত্যিই কি কিচ্ছু জানত না মা? এখনও জানে না?

***

"কত দাম বললি?" আঁচলে হাত মুছতে মুছতে সুছন্দা কিচেন থেকে এসে জিজ্ঞেস করল মমিয়াকে।

"কীসের?" খানিকটা অন্যমনস্ক হয়েই উত্তর দিল মমিয়া। খুব মনোযোগ দিয়ে একটা পত্রিকার এডিটোরিয়াল পড়ছিল সে।

"ওই যে তখন বললি না ল্যাপটপ কেনার কথা?"

"অ... হ্যাঁ, ভালোই দাম আছে।"

"কত দাম বলবি তো!"

"বললাম তো, অনেক দাম। পঁচিশ-তিরিশ তো বটেই।"

"ওরে বাবা, বলিস কী! এত?"

"হুম, এত। সুতরাং এই এপিসোড ছাড়ো।"

"কিন্তু তোর যে দরকার বলছিলি—"

"কিছু করার নেই। হাতে একটু টাকা-পয়সা জমুক, তারপর কিনে নেব।" বলে মায়ের মুখের দিকে তাকাল মমিয়া। রান্নাঘরের গরমে মায়ের মুখটা ঘেমে উঠেছে। ভিজে চুলের কুচি কপালে লেপটে রয়েছে। প্রায় চুয়াল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেল মা'র। এখনও এত সুন্দরী! মমিয়ার ছোটোবেলাতে ওকে যদি কেউ মজা করেও বলত, "তোর থেকে তোর মা অনেক বেশি সুন্দর দেখতে", অমনিই ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলত মমিয়া। তবে কথাটা যে সত্যি একটু বড়ো হওয়ার পরে বুঝেছে। যদিও মা-কে কোনোদিনও বিউটি পার্লার যেতে কিংবা খুব সাজতে দেখেনি ও। আসলে এক-একজন মানুষকে ঈশ্বর নিজে হাতে সাজিয়ে পাঠান। তাদের বাইরে থেকে আর নিজেকে সাজাতে হয় না। মা-ও সেই ধরনের মানুষ। এই বয়েসেও টানটান নির্মেদ চেহারা। বোধহয় একটু বাড়াবাড়িই।

"যা ভালো বুঝিস," বলে মা চলে যাচ্ছিল। মমিয়া জিজ্ঞেস করল, "হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে?"

"এমনিই।"

"ও, ঠিক আছে।" বলে আবার পড়ায় মন দিল মমিয়া।

***

আজ মমিয়ার অফ ডে। বিকেলে তমালের সঙ্গে দেখা করার আছে। গতকাল রাত্রে ফোন করেছিল তমাল। কী যেন একটা গিফ্‌ট কিনেছে মমিয়ার জন্য। কী গিফ্‌ট বলেনি। ওটাই নাকি সারপ্রাইজ। ছেলেটা সারাক্ষণ নিজের খেয়ালেই থাকে। চাকরি-বাকরি কোনোদিন করবে বলে

মনে হয় না। শুধু টিউশনে আর কী-ই বা হয়? বিয়ের পর যে সংসার যে মমিয়াকেই টানতে হবে সেটা দু'জনেই জানে। যাক গে, ছেলেটা তো ভালো! মনটা একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল মমিয়ার। কলিংবেলের শব্দ হল। দেয়ালঘড়ির দিকে তাকাল ও। বেলা এগারোটা বাজে। এই সময় আবার কে এল?

দরজা খুলল মা। "ও বাবা, তুমি এখন!" মা'র গলায় চাপা উচ্ছ্বাস। নিজের ঘরে বসে শুনতে পেল মমিয়া।

"হ্যাঁ, চলে এলাম। মমিয়া আছে?"

"হুঁ, আছে তো।"

"কই?"

"ওর নিজের ঘরে। যাও।"

অসীমকাকু এসেছে। এই সময় কেন? ম্যাগাজিনটায় প্রায় মুখ ডুবিয়ে ফেলল মমিয়া।

"কী রে, কী করছিস?" ঘরে ঢুকে মমিয়ার বিছানার একপাশে ঝপ করে বসে পড়ল অসীম।

"ও, তুমি! কখন এলে?"

"এই তো এখনই। তারপর, অফিস-টফিস কেমন চলছে, বল?"

"চলছে মোটামুটি।"

"শোন, এখন ঝট করে চেঞ্জ-টেঞ্জ করিস না। আগে এক্সপিরিয়েন্সটা করে নে। তারপর বাইরে কোথাও বেটার অপারচুনিটি পেলে চলে যাবি।"

"কেন? হঠাৎ বাইরে যাব কেন?" ম্যাগাজিন থেকে মুখ সরিয়ে সটান অসীমের দিকে তাকাল মমিয়া।

"না মানে..." সামান্য ঢোঁক গিলল অসীম, "এখন তো দেখি প্রায় সব ভালো ছেলেমেয়েরাই স্টেটের বাইরে চলে যায়। হা হা হা— " ছোটো ভুঁড়িটা দুলিয়ে হাসল অসীম। হাসিটা একঝলক দেখে নিয়ে আবার ম্যাগাজিনে চোখ রাখল মমিয়া।

"নাহ্, তুই পড়, আমি উঠি।"

"আচ্ছা।"

অসীম ঘর ছেড়ে বেরিয়েই হাঁক পাড়ল, "সুছন্দা, কই গেলে? আমি চললাম।"

কিচেন থেকে মা সাড়া দিল, "একটু বসে যাও। চা বসিয়েছি।"

"অ... বসিয়ে ফেলেছ? তাহলে তো বসতেই হয়, হে হে!" বলে অসীম ড্রয়িংরুমের সোফায় ধপাস করে বসে সেন্টার টেবিল থেকে

রিমোট নিয়ে টিভি অন করল। নিজের ঘরে বসেই ম্যাগাজিনের আড়াল দিয়ে দেখল মমিয়া। লোকটাকে যে কেন এত অসহ্য লাগে!

মা কিচেন থেকেই চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "মম, তুই চা খাবি তো?"

"না।"

"আচ্ছা।"

সোফায় পা তুলে বাবু হয়ে বসে অসীম বলল, "বুঝলে সুছন্দা, সেদিন এক প্যাকেট গ্রিন টি কিনলাম। ন'শো টাকা কিলো। কিন্তু টেস্ট দারুণ। মন ভরে যায়। নিয়ে আসব একদিন।"

"আচ্ছা, এনো। এখন এই গরিবের চা-ই খাও।" মা চায়ের কাপ বাড়াল অসীমকাকুর দিকে।

"গরিবের চা? হা হা হা!" হাসতে হাসতে কাপটা নিল অসীম।

এতে হাসির কী হল? মনে মনে আরও রাগ হল মমিয়ার। লোকটা যে কী ভাবে আর কী চায়!

"তোমার কাপ কই?" মা-কে জিজ্ঞেস করল অসীম।

"আমি কিচেনেই খেয়ে নিচ্ছি। প্রচুর কাজ। আজ একটুও সময় নেই।"

"আরে ধুর! প্রচুর কাজ! ছাড়ো তো। বসো একটু। দরকারি কথা আছে।"

মমিয়া খুব ভালো করেই জানে অসীমকাকুর এই দরকারি কথাটা কী হতে পারে। খুব জোর হলে মা ডাক্তার দেখিয়েছে কি না, ওষুধ সব আছে কি না কিংবা বাড়িতে কোনোকিছুর প্রয়োজন আছে কি না— এইসব প্রশ্ন। অসহ্য! মমিয়া আস্তে করে বিছানা ছেড়ে উঠে নিজের ঘরের দরজা পুরোটা বন্ধ করে দিতে গিয়েও খুব সামান্য ফাঁক রেখে আবার খাটে এসে বসল।

***

বিকেলে জিটি রোড ধরে হাঁটছিল মমিয়া আর তমাল। মমিয়া তমালের সাইকেলটার দিকে আঙুল তুলে বলল, "এবার প্লিজ তোমার এই ঝড়ঝড়ে মালটাকে ফেলবে?"

"হি হি হি! আমার বুলেটকে এমন বোলো না! বেচারার বয়েস হয়েছে বলে যা খুশি তা বলাটা ঠিক নয়।"

"তো একটু সার্ভিসও তো করাতে পারো। কী বিচ্ছিরি শব্দ হয়, ইস্!"

"হুম, এইবার করে ফেলব। আজ একটা ভালো টিউশন পেয়েছি। ছাত্রের বাবা বিশাল মালদার। একমাত্র ছেলে। ক্লাস এইটে ফেল করেছে। শুধু সায়েন্স গ্রুপ পড়াতে হবে। সপ্তাহে তিনদিন, আটশো দেবে।"

"ফেল করা ছাত্রও পড়াচ্ছ আজকাল!" ভুরু কুঁচকে তাকাল মমিয়া।

"উপায় কী? খাতায় একবার নাম লিখিয়ে ফেলেছি যখন, আর কি সকাল-বিকেল-পূর্ণিমা-অমাবস্যা দেখলে হবে?"

"খাতা? কীসের খাতা?"

"এই রে! না না, কিছু না!" জিভ কাটল তমাল।

"কী যে বলো সব! আদ্ধেক কথা বুঝি না।"

"যাক গে, বাদ দাও। বাচ্চা মেয়ে, অত বুঝে কাজ নেই!" বলে মুচকি হাসল তমাল।

"আমি বাচ্চা! লজ্জা করে না তোমার বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে?"

"হ্যাঁ, করে তো! সেইজন্যই দেখো না কীরকম লজ্জা পেয়ে থাকি তোমার কাছে!"

"একটা থাপ্পড় মারব। বাঁদর ছেলে কোথাকার! ফর্মটা তুলেছিলে?"

"কোন ফর্ম? ও, হ্যাঁ হ্যাঁ— মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের তো? কব্বে তুলে নিয়েছি। ফিলাপও হয়ে গেছে। শুধু ওই ডিডিটা বানানো বাকি। মাইরি দুশো টাকা হেব্বি গায়ে লাগছে!"

"ঠিক আছে, আমি দিয়ে দেব। আপনি শুধু দয়া করে ফর্মটা জমা করুন।"

"আরে না না, তুমি কেন দেবে? আমি এমনিই বললাম। এই সপ্তাহেই জমা করে দেব।"

"এই সপ্তাহেই জমা করবে? আচ্ছা? লাস্ট ডেট কবে জমা দেওয়ার?"

"এই তো, এই উইকেই।" স্মার্টলি বলল তমাল।

"উফ্, ভগবান বেছে বেছে কেন যে আমার কপালেই এমন একটা অপদার্থকে জোটাল!" কপালে হাত রেখে বলল মমিয়া।

"কেন? আমি আবার কী করলাম?"

"ফর্মটা জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট আগামীকাল। তুমি ভুলে গেছ অথচ আমার মনে রয়েছে... আশ্চর্য!"

"আরে কী মুশকিল, আগামীকাল তো এই সপ্তাহের ভেতরেই পড়ে, না কি?"

"প্লিজ, আমাকে আর টুপি পরিয়ো না। অনে-ক পরিয়েছ এতদিন।